আমরা কেন বিয়ে করি

শিশির আজম

আমরা কেন বিয়ে করি? সত্যি বলতে কী, আমরা জানি না। তবে গায়ক নচিকেতার মতো এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় না যে, মানুষ দুই প্রকার, জীবিত ও বিবাহিত। বিয়ে করলে সব সমস্যা মিটে যায়– এটা কেউ দিব্যি করে বলতে পারে না। আবার বিয়ে না করলে সমাজ-সংসার উচ্ছন্নে যায়, এরও নজির নেই। বরং বিয়ে-বিরোধীরা আঙুল তুলে হয়ত উদাহরণ দেবে, ওই ভারত রাষ্ট্রের এক সময়কার শীর্ষ ক্ষমতাধর ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট এ পি জে আবদুল কালাম তো বিয়ের পানি গায়েই ছোঁয়ান নি। বলা বাহুল্য, ওই রাষ্ট্রের পূর্বেকার সরকারপ্রধানও ছিলেন অবিবাহিত।

বিয়েপ্রথা যতদিন এ ভুবনে আসে নি ততদিন মানব প্রজাতি বৃদ্ধিতে খুব সমস্যা হয়েছে এমন কথা ইতিহাসে বা নৃতত্ত্বে নেই। বিয়েপ্রথা যখন শুরু হলো, বলা যায় তখন থেকেই ছেলেদের দুঃখের শুরু। এতদিন যৌথভাবে নারী-পুরুষ মিলে সংসার চলছিল। বরং জীবিকা নির্বাহের জন্য মেয়েরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। ছেলেদের কাজ ছিল বিনে পয়সায় রসগোল্লা খাওয়া। সময় পালটেছে। চালু হয়েছে বিয়ের নিয়ম। কিন্তু ছেলেরা বিয়ে করতে চায় না। পড়তে চায়, বিজ্ঞানী হতে চায়, ডাক্তার হতে চায়। অনেক ছেলে পাগলামি করে কবি হতে চায়। বিয়ে করতে চায় না। কিন্তু করে। দুদিন আগে হোক কি পরে হোক। কেন করে? লাড্ডু। দিল্লীকা লাড্ডু। এর প্রতি কার না ঝোঁক। কিন্তু আমাদের সময়ের রাঙা চক্ষু, রাষ্ট্রীয় বেড়ী এ ইচ্ছার সামনে দেয়াল। ফেলো কড়ি মাখো তেল। বিয়ে করো লাড্ডু খাও। কড়ি আমার থাক।

মেয়েরা কোনোকালেই বিয়ে করে না। বিয়ে তাদের হয়। বিয়ের নিয়ম আসার আগে মেয়েরা সন্তান ধারণ করত। কার ঔরসের সন্তান তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি। সে মা। এর ওপর আবার কথা কী? কিন্তু সমাজে-গোত্রে কিছু লোক কাজ না করেই খেতে চায়। কীভাবে? তারা বিভিন্ন ভেক ধরল। তারা যে আলাদা কিছু এটা বোঝাতে। না হলে অন্য লোকেরা তাদের মানবে কেন? কেন শুধু শুধু খেতে দেবে? এই কাজ না করা লোকগুলোই আরেকটু শক্তপোক্ত-চালাকচতুর হয়ে একটা একটা করে নিয়ম চালু করল। যেখান থেকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কর্মজীবী জনসমষ্টির উৎপাদনের অংশ তার ভাণ্ডারে জমা হবে। এই নিয়মগুলোর মধ্যে বিয়ে একটা। মেয়েরা শারীরিকভাবে একটু দুর্বল। তাই চাপটা ওদের ওপরই সিংহভাগ গেল।

একবিংশ শতাব্দী এসে গেল। নিয়মটা আছে। কোনো কোনো মেয়ে নাকি এখন বিয়ে করে। হ্যাঁ, তা তো বিয়েই। অভিভাবকরা এতে অখুশি নন। বিয়ে জিনিসটা তো শক্তভাবেই আছে। বিখ্যাত ঠাকুর বাড়ির অগ্নিকন্যা সরলা ঘোষাল পর্যন্ত বিয়ের লাঠির সামনে ফণা নামিয়েছেন। ডাক্তারি বিদ্যায় মেধাবী মেয়ে শেষে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর আশ্রয়ে ঠিকানা খুঁজেছেন। ছেলেরা

নিরাপত্তা চায়। মেয়েরা নিরাপত্তা চায়। অভিভাবকরা নিরাপত্তা চায়। নিরাপত্তা মানে বিয়ে। তা ছেলেমেয়েদের হাত-পা বেঁধে হোক বা বুঝিয়ে-শুনিয়ে।

রাষ্ট্রের কত অকাজ-কুকাজ করতে হয়। ছেলেমেয়েদের হাত-পা বাঁধা না থাকলে তারা গণ্ডগোল পাকাতে কতক্ষণ!

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে নারী-পুরুষের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অবিবাহিত নারী-পুরুষের জন্য তার নীতি আলাদা। নারী-পুরুষ যদি পরস্পর ভালোবেসে যৌনজীবন যাপন করে তবে তা হবে ব্যভিচার। আবার বিবাহিত জীবনে পুরুষ যদি স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করে, শতবার ধর্ষণ করে ধর্ম নামক প্রতিষ্ঠান তাতে নাক গলায় না। কেন না এটা তার জন্য উপযোগী। এর থেকে তার জন্য মুনাফা নামক পুষ্টি সরবরাহ হয়। ফলে এখানে ন্যায়-অন্যায়, শুদ্ধ-অশুদ্ধ দেখলে চলে না। ইসলাম ধর্মে তো একাধিক বিয়ের স্বীকৃতি আছে। বিয়ে, তাও একাধিক! অবশ্য শুধু পুরুষের জন্য। পুরুষ খোঁয়াড়ে এক পাল ছাগল পোষার মতো করে ঘরে একাধিক বউ পুষতে পারে। এখানে পুরুষ ও ধর্ম পরস্পর স্বার্থ রক্ষাকারী। ধর্মের গোলা টইটম্বুর।

তবে বাংলাদেশের আজকের কালের শক্তিশালী লেখক নাসরীন জাহান তাঁর যৌবন কালের বর্ণনায় যা বলেছেন তা কিন্তু ভিন্ন :

আমাদের প্রজন্ম থেকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মে, বিশেষ করে নাগরিক জীবনে, শারীরিক ব্যাপারে দ্রুত বিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমাদের সময়ে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছে। এই বন্ধুত্বের মধ্যে একটি আলাদা মর্যাদা আমি লক্ষ্য করেছি, যার মধ্যে সহপাঠীদের মধ্যে নারী ও পুরুষ একটি মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে। যেখানে প্রেমহীনভাবে শরীর আসার প্রশ্নই ছিল না। *দৈনিক ভোরের কাগজ, ২৮ ভাদ্র ১৪০১*

নতুন প্রজন্ম নিশ্চয় আরো এগিয়েছে। তবে রাষ্ট্রযন্ত্রের চোখ এখনো পেছনে।

সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র ভাস্করজুটি নভেরা আহম্মেদ ও হামিদুর রহমান। ষাট ও সত্তরের দশকে আমাদের রক্ষনশীল সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্যারিস-মাদ্রিদ-ঢাকা চষে বেড়িয়েছেন, এক সাথে কাজে মেতেছেন, খেয়েছেন, শয্যা নিয়েছেন। বিয়ে-সম্পর্ক ছাড়াই। বাংলাদেশের প্রথম আধুনিক ভাস্কর এরাই। বিশেষত নভেরার শিল্প-চেতনা ছিল অতি উঁচু পর্যায়ের, মৌলিক ও সাহসী। কিন্তু এ এক রহস্য যে– কী কারণে নভেরা বিয়ে করলেন। হামিদুরকে নয়, প্যারিসের এক ব্যবসায়ী ও শিল্পরসিককে। এরপর এই কিংবদন্তি হারিয়ে গেলেন। অবশ্য নভেরা ও হামিদুর আমাদের জাতির একটি আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। সেই আবেগের নাম শহিদমিনার। আমাদের প্রাণের শহিদমিনারের রূপকার তাঁরাই। জানি না বিয়ে নামক ষড়যন্ত্রই আমাদের কাছ থেকে নভেরাকে সরিয়ে দিয়েছে কি না।

আলাউদ্দিন খাঁ তাঁর প্রিয় শিষ্য রবিশঙ্করের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন নিজ কন্যা অন্নপূর্ণাকে। আসলে তিনি অন্নপূর্ণাকে কোরবানি দিয়েছিলেন। এখন আমরা জানি, অন্নপূর্ণার সূচনাটা রবিশঙ্করের চেয়ে অনুজ্জ্বল ছিল না। এমন কথা মার্কিন কবি সিলভিয়া প্লাথের ক্ষেত্রেও খাটে। বিয়ে তাদের জন্য ছিল আত্মহত্যা। তবে এখানে ব্যক্তির আবেগের দোষ সমান।

আমরা কেন বিয়ে করি– প্রশ্নটা এমন না হয়ে হওয়া উচিত ছিল সমাজ, ধর্ম বা রাষ্ট্র কেন আমাদের বিয়ে দেয়।

ভয়ে।

প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন মানবিক রীতিগুলোকে শৃঙ্খলায় আনা অর্থাৎ নিয়মে বেঁধে রাখা। নইলে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। এর জন্য সহজ একটা পথ হলো দুজন নারী-পুরুষ যারা হয়ত পূর্বে কোনোদিন কেউ কাউকে দেখে নি তাদের কাগুজে সম্পর্কে বেঁধে ফেলা। যেখানে হৃদয়ের কোনো ব্যাপার নেই। এই দুজন যদি পূর্ব পরিচিতও হন তবু সামাজিক বা পারিবারিক সম্মতি না থাকলে বিয়ের জন্য তা মূল্যহীন। অর্থাৎ বিয়েতে হৃদয়ের ভূমিকা কম।

নারী-পুরুষকে বিয়ের ফাঁদে ফেলেই রাষ্ট্র নিশ্চিন্ত হয় না। দম্পতি কখন কীভাবে সঙ্গমে মিলিত হবে, জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পদ্ধতি উৎকৃষ্ট, কয়টি সন্তান নেবে– সব ঠিক করে দেয় রাষ্ট্র।

তবে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের সব কার্যক্রমই প্রতিক্রিয়াশীল, এটা বলা বেঈমানি হয়ে যায়। যেমন রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এখন নিয়মিতই লাক্স-চ্যানেল আই সুন্দরী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর সার্বিক কার্যক্রমে বাংলাদেশের প্রথিতযশা ও সম্মানিত অনেকে সংযুক্ত আছেন। দৃশ্যত বিয়ের ব্যাপারে এখানে বৈপরীত্য আছে। এই প্রতিযোগিতার অন্যতম একটি নিয়ম হলো, প্রতিযোগিনীকে অবশ্যই অবিবাহিত হতে হবে। কিন্তু এর মধ্যে মহা ফ্যাঁকড়া আছে। এমন না যে আয়োজকরা কোনো সৎ উদ্দেশ্যে এমন নিয়ম করেছেন। প্রতিযোগিনীদের মধ্যে যারা সেরা দেশে আসতে পারবেন মিডিয়া তাদের আকাশে না তুলে ছাড়বে না। সেরা তিনে থাকতে পারলে তো কথাই নেই। তাহলে বিবাহিতদের কি সবাই অসুন্দরী? কম যোগ্য? না। অবিবাহিত তারকারা যেভাবে পাবলিকের বুকে ঢেউ তোলে, তেমনটা বিবাহিত তারকাদের দিয়ে সম্ভব নাও হতে পারে। এতে ব্যবসা ভালো চলবে না। পুঁজিবাদী বাজারের উদ্দেশ্য মার খাবে। কে গুণে শ্রেষ্ঠ তা বিবেচনা করে আয়োজকদের ব্যবসা চলে না। মেয়েদের কচি শরীর, টগবগে শরীর পাবলিককে যত খাওয়ানো যাবে ততই মুনাফা!

কয়েক বছর আগে টিভি চ্যানেল এনটিভি বিখ্যাত কোম্পানি ইউনিলিভারের সৌজন্যে দেশব্যাপী সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এতে অনেক সংগীত প্রতিভা বের হয়ে আসে। সাধারণ মানুষ মুগ্ধ। সবচেয়ে বড়ো কথা এই শিল্পীদের গান যতটা আমাদের কাছে এসেছে তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি এসেছে বিদেশি কোম্পানি ইউনিলিভারের পণ্য। আন্যান্য টিভি চ্যানেলও এই

দৌড়ে থেমে নেই। গান এবং শরীর দুটো মিলিয়ে ভোক্তাদের খিদে নিবারণ হচ্ছে, খিদে তৈরি হচ্ছে। লক্ষণীয় বিষয় এই চ্যানেলগুলো তরুণ বিজ্ঞানী, সৃজনশীল লেখক– এদের খোঁজে না। কেননা এদের শরীর নেই। দর্শককে খাইয়ে মুনাফা বাড়ানো যাবে না।

অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, এসব প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাপী উদারীকরণের সুযোগে যুবতী মেয়েদের নিয়ে হাট বসিয়েছে, দুটো করে খাওয়ার ধান্ধায়। বিয়ে-ব্যবস্থার প্রতি তাদের কোনো বিরাগ নেই।

কিন্তু এটা প্রধানত রাষ্ট্রের উঁচুতলার ব্যাপার। নিচের দিকের অবস্থাটা মধ্যযুগের মতোই। বরং তার চেয়েও খারাপ। রাষ্ট্র নিজের অস্তিত্বের স্বার্থে বিয়েকে উৎসাহ দেয়। বিবাহিতদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা দেয়। এতে কী হয়? ছেলেমেয়েদের যখন কোনো যোগ্যতাই থাকে না তখন তারা বিয়ে করে। একটা যোগ্যতা অন্তত অর্জিত হয়। এতে কোনো ছেলে একটা মেয়ের ওপর অভিভাবকত্ব করার অবারিত সুযোগ পেয়ে যায়। কিন্তু মেয়ের কী লাভ? সে তো সম্পত্তির অধিকারও ঠিকমতো পায় না। রাষ্ট্র বলে, সে আশ্রয় ও নিরাপত্তা পায়। কাগজে-কলমে তার কিছু নাগরিক অধিকারও অর্জিত হয়। যদিও বাস্তবতা অন্যরকম।

তাহলে অর্থে দাঁড়াচ্ছে, রাষ্ট্র তার দিকেই কিছুটা চোখ দেবে যে বিয়ে করবে। বিয়ে করে খাঁচায় ঢুকবে। ডান্ডা হাতে রাষ্ট্র নামক যন্ত্রটাকে আক্রমণ করতে আসবে না। বেগম রোকেয়ার জন্য আমার করুণা হচ্ছে। বেচারাকে দু-দুটো বিয়ে করতে হয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের মুখ বন্ধ রাখতে।

এখন আপনারাই বলুন, আমি কেন বিয়ে করব না?

শিশির আজম সহকারী শিক্ষক, এলাংগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ। shishir01978@gmail.com